নবম অধ্যায়: দ্রুত গতির জীবন

চিরকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ বা এলিয়েনদের সৃজনশীলতা কখনোই যথেষ্টা হবে না, যদি না “চিরকাল” বলে কিছু একটা থাকে। মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট পর্যন্তই যদি টিকে থাকে, তাহলে তো অ্যারমাগেডন এড়ানোর কোনো উপায় নেই। ষষ্ঠ অধায়্যে আমি দেখিয়েছি, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি কীভাবে এর মোট ভরের ওপর নির্ভর করে। মহাবিশ্ব হয় চিরকাল প্রসারিত হবে। অথবা একসময় আবার গুটিয়ে যেতে থাকবে। পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্বের ভর এই দুই সঙ্কট সীমারই খুব কাছাকাছি। একসময় মহাবিশ্ব আবার গুটিয়েই যেতে শুরু করলে আগের অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধিমান জীবের যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি সেটা একদম ভিন্ন রকম হয়ে যাবে।

মহাজাগতিক সঙ্কোচনের প্রাথমিক অবস্থায় ভয়ের তেমন কিছুই নেই। একটি বল যেমন এর গতিপথের চূড়ায় ওঠে, তেমনি মহাবিশ্বও খুব ধীরে ভেতরের দিকে পতন শুরু করবে। আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি, মহাবিশ্ব দশ হাজার কোটি বছর পরে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছবে। তখনও প্রচুর নক্ষত্র জ্বলতে থাকবে। অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে আমাদের বংশধররা তখনও ছায়াপথের গতিপথ দেখতে পারবে। দেখা যাবে, ছায়াপথগুচ্ছরা ক্রমশ ধীরে দূরে সরছে। একসময় দূরে সরা বন্ধ করে আবার একে অপরের দিকে আসতে থাকবে। আমাদের বর্তমানে দেখা ছায়াপথগুলো সে সময় আরও চারগুণ দূরে থাকবে। মহাবিশ্বের বয়স বাড়ার কারণে সে সময়ের জ্যোতির্বিদরা আমদের চেয়ে দশগুণ বেশি দূরের জিনিস দেখতে পারবে।১ফলে আমাদের চেয়ে তাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হবে।

পুরো মহাবিশ্ব পাড়ি দিতে আলোর বহু বিলিয়ন বছর সময় লেগে যায়। ফলে এখন থেকে ১০০ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) বছর পরের জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বের সঙ্কোচন দেখার জন্যে খুব বেশি সময় পাবেন না। প্রথমে তারা দেখবেন, অপেক্ষাকৃত কাছের ছায়াপথরা গড়ের ওপর দূরে না সরে কাছাকাছি হচ্ছে। কিন্তু দূরের ছায়াপথের আলো তখনও লোহিত সরণ২ প্রদর্শন করবে। দুই শ থেকে এক হাজার কোটি বছরের মধ্যের কোনো এক সময়েই শুধু সঙ্কোচন দৃশ্যমান হবে। তবে মহাজাগতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের সূক্ষ্ম পরিবর্তন আরও সহজে বোঝা যাবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এই পটভূমি বিকিরণ বিগ ব্যাংয়ের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে এর তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রার তিন ডিগ্রি ওপরে। মানে ৩ ডিগ্রি কেলভিন। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এই তাপমাত্রা কমছে। দশ হাজার বছর পরে এটি কমে ১ ডিগ্রি কেলভিন হবে। প্রসারণের সর্বোচ্চ বিন্দুতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম হবে। সঙ্কোচন শুরু হওয়া মাত্রই তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে। মহাবিশ্বের বর্তমান সময়ের ঘনত্বে পৌঁছলে আবারও তাপমাত্রা হবে ৩ ডিগ্রি কেলভিন। এতে সময় লাগবে আরও দশ হাজার কোটি বছর। মহাবিশ্বের উত্থান ও পতন সময়ের সাপেক্ষে মোটামুটি প্রতিসম৩।

মহাবিশ্ব রাতারাতি গুটিয়ে যাবে না। সত্যি বলতে, দুই শ থেকে এক হাজার কোটি বছর ধরে আমাদের বংশধররা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। সেটা সঙ্কোচন শুরু হলেও অব্যাহত থাকবে। কিন্তু ধরুন সঙ্কোচন শুরু হতে আরও অনেক বেশি সময় লাগল। এই যেমন এক হাজার-কোটি-কোটি-কোটি বছর। এটা হলে কিন্তু পরিস্থিতি এতটা অনুকূলে থাকবে না। এক্ষেত্রে প্রসারণ সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছার আগেই নক্ষত্ররা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। চিরকাল প্রসারিত হতে থাকা মহাবিশ্বে বেঁচে থাকা প্রাণীরা যে সমস্যায় পড়ত, সেই একই সমস্যা এখানেও হবে।

এখন থেকে যত বছর পরই সঙ্কোচন শুরু হোক না কেন, একইসংখ্যক বছর পরে মহাবিশ্ব আবার বর্তমান আকারের সমান হবে। তবে দেখতে অনেকটা আলাদা হবে। সঙ্কোচন দশ হাজার বছর পরে হলেও এখনকার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক ব্ল্যাকহোল থাকবে। নক্ষত্র থাকবে অনেক কম। বাসযোগ্য গ্রহ থাকবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

মহাবিশ্বের আকার পুনরায় বর্তমান আকারের সমান হতে হতে সঙ্কোচন হবে অনেক দ্রুত গতিতে। প্রায় সাড়ে তিন শ কোটি বছরে এর আকার অর্ধেক হয়ে যাবে। ক্রমেই সঙ্কোচন হার আরও বেড়ে যাবে। তবে আসল খেলা শুরু হবে এর প্রায় এক হাজার কোটি বছর পরে। এ সময় মহাজগাতিক পটভূমি তাপ বিকিরণের তাপমাত্রা বড় হুমকি হয়ে দেখা দেবে। তাপমাত্রা ৩০০ ডিগ্রি কেলভিন হলে তাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচা পৃথিবীর জন্যে কঠিন হয়ে যাবে। এটি চরমভাবে গরম হতে থাকবে। প্রথমেই গলে যাবে হিমমুকুট ice-cap) বা তুষারস্রোত। এরপর সমুদ্রের পানি বাষ্প হতে শুরু করবে।

৪ কোটি বছর পরে পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রার সমান হবে। পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো বাসের জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়বে। অবশ্য পৃথিবী তার আগেই বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। কারণ সূর্য প্রসারিত হয়ে লোহিত দানব (red giant) হবে। এই সময়টায় আমাদের বংশধররা যাওয়ার জন্যে আর কোনো জায়গা খুঁজে পাবে না। কোনো নিরাপদ বাসস্থান থাকবে না। তাপ বিকরণে ভর্তি থাকবে মহাবিশ্ব। সব জায়গার তাপমাত্রা হবে ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আরও বাড়তে থাকবে। নিজেকে গরম পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া বা হিমায়িত পরিবেশ তৈরি করে তাপ থেকে রক্ষা করতে পারা কোনো জ্যোতির্বিদ দেখবে মহাবিশ্ব পাগলের মতো গতিতে গুটিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিলিয়ন বছরেই আকার হয়ে যাচ্ছে অর্ধেক। ততদিন পর্যন্ত টিকে থাকা কোনো ছায়াপথকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। ততদিন তারা একে অপরের সাথে মিশে যাবে। তবে তখনও অনেক ফাঁকা স্থান থাকবে। নক্ষত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে না বললেই চলে।

অন্তিম মুহূর্ত কাছে চলে এলে মহাবিশ্বের অবস্থা খুব দ্রুত বিগ ব্যাংয়ের সামান্য পরের সময়ের মতো হয়ে যেতে থাকবে। জ্যোতির্বিদ মার্টিন রিজ সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বের একটি ধর্মীয় দিক নিয়ে কাজ করেছেন। পদার্থবিদ্যার কিছু সাধারণ নীতিমালা প্রয়োগ করে তিনি সঙ্কোচনের একটি চূড়ান্ত চিত্র তৈরি করতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত মহাজাগতিক তাপীয় বিকিরণ এত তীব্র হবে যে রাতের আকাশ বেরসিক লাল রং বিকিরণ করবে। ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব হয়ে ওঠবে এক সর্বগ্রাসী মহাজাগতিক চুল্লি। যা সব ধরনের ভঙ্গুর প্রাণকে শেষ করে দেবে, সে যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন। এই তাপমাত্রায় গ্রহদের বায়ুমণ্ডলও টিকে থাকবে না। ক্রমেই লাল বিকিরণ হলুদ ও শেষে সাদা হয়ে যাবে। পুরো মহাবিশ্বে উপস্থিত প্রচণ্ড এই তাপীয় বিকিরণ একসময় নক্ষত্রের অস্তিত্বকেই হুমকিতে ফেলবে। বিকিরণের মাধ্যমে শক্তি ক্ষয় করতে না পেরে নক্ষত্ররা নিজেদের অভ্যন্তরে তাপ জমা করবে। একসময় ঘটাবে বিস্ফোরণ। উত্তপ্ত গ্যাস বা প্লাজমা দ্বারা স্থান ভর্তি হবে। এর বিকিরণ হবে প্রচণ্ড তীব্র। সবসময় এর উষ্ণতা আরও বাড়তেই থাকবে।

পরিবর্তনের গতি বাড়তে থাকবে। পরিস্থিতি হয়ে ওঠবে আরও চরম। ক্রমেই অল্প অল্প সময়ের মধ্যেই মহাবিশ্বে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যাবে। প্রথমে এক লক্ষ বছর, পরে এক হাজার, পরে এক শ বছরেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। যা শেষ হুট করে মোড় নেবে ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের দিকে। তাপমাত্রা বেড়ে প্রথমে মিলিয়ন ও পরে বিলিয়ন ডিগ্রিতে পৌঁছবে। যে পদার্থ বর্তমানে ব্যাপক জায়গা দখল করে আছে তা গুটিয়ে ছোট্ট জায়গায় স্থান নেবে। একটি ছায়াপথের সব ভর মাত্র কয়েক আলোকবর্ষ চওড়া স্থানে আশ্রয় নেবে। শেষ তিন মিনিট চলে এল বলে।

শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা এত বাড়বে যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসও ভেঙে যাবে। বস্তু ভেঙ্গে গিয়ে মৌলিক কণাদের একটি সুষম স্যুপে পরিণত হবে। আপনি যতক্ষণে এই পৃষ্ঠাটি পড়বেন তার চেয়ে কম সময়ে বিগ ব্যাং ও বহু প্রজন্মের নক্ষত্রের মাধ্যমে ভারী রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টির কাজটি আগের অবস্থায় ফিরে গেল। পরমাণুর যে নিউক্লিয়াসরা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর ধরে টিকে ছিল, আজ তারা শেষ হয়ে গেল চিরতরে। এক ব্ল্যাকহোলরা ছাড়া আর সব ধরনের কাটামোগুলো অনেক আগেই বিলীন হয়ে গেছে। মহাবিশ্বে বিরাজ করছে এক মার্জিত কিন্তু অশুভ সারল্য। আয়ু আছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ক্রমেই দ্রুত হারে মহাবিশ্বের সঙ্কোচনের সাথে সাথে তাপমাত্রাও বাড়ছে অনেক দ্রুত হারে। ঠিক কতটা বাড়ছে সেটা কারও জানা নেই। বস্তু এত শক্ত হয়ে গুটিয়ে গেছে যে প্রোটন ও নিউট্রনের আর আলাদাভাবে কোনো অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু কোয়ার্কের স্যুপ। সঙ্কোচনের হার কিন্তু তখনও বাড়ছে।

এবার চূড়ান্ত মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সময় এসেছে। আর মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ড বাকি। ব্ল্যাকহোলরা একে অপরের সাথে একীভূত হতে শুরু করবে। গুটিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্বের সাধারণ অবস্থা থেকে ব্ল্যাক হোলের ভেতরের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন হবে। এরা এখন নিছকই স্থানকালের এমন অঞ্চল যারা একটু আগেভাগেই শেষ পরিণতিতে চলে এসেছে। যাদের সাথে পরে যোগ দিচ্ছে মহাবিশ্বের বাকি অংশ।

একেবারে শেষ সময়ে মহাকর্ষ সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। এটি নির্মমভাবে স্থান ও কালকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে। স্থানকালের বক্রতা ক্রমেই দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ক্রমেই বড় থেকে বড় অঞ্চলের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে ছোট থেকে ছোট আয়তনের স্থানে জায়গা নেয়। প্রচলিত তত্ত্ব বলছে, ভেতরের দিকের এই অন্তঃস্ফোটন অসীম শক্তি অর্জন করে। ফলে সব বস্তু দুমড়ে-মুচড়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। ধ্বংস করে দেয় প্রতিটি ভৌত বস্তুকে। এমনকি স্থান ও কালও রেহাই পায় না। সবকিছুর স্থান হয় স্থানকালের সিংগুলারিটিতে।

এটাই শেষ পরিণতি।

আমরা এখন পর্যন্ত যতটা বুঝি, মহাধ্বস শুধু বস্তুরই ইটি ঘটায় না, ইতি ঘটায় সকল কিছুরই। মহাধ্বসের সময় কাল নিজেও অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। ফলে তার পরে কী ঘটবে প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। যেমনিভাবে বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করাও অর্থহীন। “পরবর্তী” বলতে আসলে কিছুই নেই। কাজের অভাব হওয়ার মতোও সময় নেই। ফাঁকা থাকার মতোও নেই কোনো স্থান। বিগ ব্যাংয়ের সময় শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসা মহাবিশ্ব মহাধ্বসের মাধ্যমে আবার মিলিয়ে যাবে শূন্যেই। এটি যে এত মহাকাল ধরে বিরাজমান ছিল তার কোনো স্মৃতিচিহ্নও নেই।

এমন একটি সম্ভাবনা দেখে কি আমাদের মন খারাপ করা উচিত? আসলে কোনটি খারাপ: চিরকাল প্রসারিত হতে হতে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে যাওয়া এক অন্ধকার শূন্যতা, নাকি গুটিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে মিলিয়ে যাওয়া এক মহাবিশ্ব? যেখানে মহাবিশ্ব থেকে সময়ই হারিয়ে যাবে সেখানে অমরত্বের সম্ভাবনাই বা কেমন?

চিরকাল প্রসারিত হতে থাকা দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্বের চেয়ে মহাধ্বসের ক্ষেত্রেই তো প্রাণের টিকে থাকা বেশি কঠিন মনে হচ্ছে। এখানে শক্তির স্বল্পতা কোনো সমস্যা নয়। বরং শক্তির আধিক্যই সমস্যা করছে। তবে বিপর্যয় চলে আসার আগে আমাদের বংশধররা হয়ত প্রস্তুতির জন্যে এক শ কোটি বা এমনকি এক লক্ষ কোটি বছর সময় পাবে। এই সময়ে প্রাণ পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে যেতে পারে। সঙ্কোচনশিল মহাবিশ্বের সবচেয়ে সরল নমুনায় স্থানের মোট আয়তন আসলে সসীম। এর কারণ হলো স্থান বেঁকে থাকে। আর এটি একটি গোলকের পৃষ্ঠের মতো করে ত্রিমাত্রিক জগতে নিজের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। ফলে বোঝা কঠিন নয় যে বুদ্ধিমান জীবেরা পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার মানে নিজেদের হাতে থাকা সবরকম রসদ নিয়ে তারা মহাধ্বসকে মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখে বোঝা যাচ্ছে না কেন তারা টিকে থাকার চিন্তা করবে। মহাধ্বসের পর যদি বেঁচে থাকা অসম্ভবই হয়, তাহলে যন্ত্রণাকে আর বাড়িয়েই বা কী লাভ? ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছরের পুরনো মহাবিশ্বে শেষ ধ্বংসের ১০ লাখ বছর আগের মৃত্যুও যা, ১ কোটি বছর পরের মৃত্যুও তা। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সময় কিন্তু আপেক্ষিক। আমাদের বংশধরদের নিজস্ব সময় কিন্তু তাদের বিপাকক্রিয়া ও তথ্য প্রসেস করার গতির ওপর নির্ভর করবে। তাই আবারও বলতে হচ্ছে, শারীরিক আকৃতিকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রচুর সময়ে পাচ্ছে বলে তারা হয়ত কোনোভাবে অমরত্ব অর্জনে সক্ষম হবে।

তাপমাত্রা বাড়ার অর্থ কণাদের চলাচলও বাড়বে। ভৌত প্রক্রিয়াগুলোও চলবে দ্রুত গতিতে। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিমান জীবের জন্যে আবশ্যকীয় প্রয়োজন হলো তথ্য প্রসেস করতে পারা। তাপমাত্রা বাড়তে থাকা মহাবিশ্বে কিন্তু তথ্য প্রসেস করার গতিও বাড়বে। যে জীব এক শ কোটি ডিগ্রির তাপগতীয় প্রক্রিয়াকেও কাজে লাগাতে শিখবে, তার কাছে মহাবিশ্বের আসন্ন মৃত্যুকে মনে হবে বহু বছর পরের ঘটনা। যতটুকু সময় বাকি আছে সেটাকে যদি মনের মধ্যে অসীম মনে হয়, তাহলে সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করার তো দরকারই নেই। সঙ্কোচন বাড়তে বাড়তে মহাধ্বস ক্রমেই দ্রুততার সাথে যতই নিকটবর্তী হবে, তাত্ত্বিকভাবে সময় ক্রমেই তত ধীরে চলবে বলে মনে হবে। চিন্তার গতি বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে অ্যারমাগেডনের দিকেও নিকটবর্তী হওয়ার বেগ বাড়বে। যথেষ্ট রসদ থাকলে এই জীবগুলো সত্যিকার অর্থেই সময় কিনতে পারবে।

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন, সঙ্কোচনশীল মহাবিশ্বে বাস করা কোনো মহাপ্রাণী একদম শেষ মুহূর্তের সসীম সময়ে অসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন করতে পারবে কি না। জন ব্যারো ও ফ্র্যাংক টিপলার এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। শেষ দিকের পর্যায়গুলোর ভৌত অবস্থার ওপর প্রশ্নটির উত্তর খুব বেশি নির্ভরশীল। যেমন ধরুন, শেষের সিংগুলারিটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় মহাবিশ্ব মোটামুটি সুষম থাকল। তাহলে কিন্তু একটি সমস্যা হয়ে যাবে। চিন্তার তই যাই হোক না কেন, আলোর গতি কিন্তু পাল্টাচ্ছে না। আলো কিন্তু সেকেন্ডে এক আলোকসেকেন্ডের৪ বেশি পথ যেতে পারবে না। কোনো ভৌত প্রতিক্রিয়া সর্বোচ্চ কত দ্রুত প্রবাহিত হতে পারে তাতে আলোর গতি একটি সীমা বেঁধে দেয়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, একদম শেষ সেকেন্ডে মহাবিশ্বের এক আলোকসেকেন্ডের বেশি দূরের দুটি জায়গার মধ্যে যোগাযোগ হওয়া সম্ভব নয়। (এটাও ঘটনা দিগন্তের একটি উদাহরণ, যেমনিভাবে ব্ল্যাকহোলে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে কোনো তথ্য পৌঁছতে পারে না।) মহাবিশ্বের সমাপ্তি নিকটবর্তী হতে থাকলে যোগাযোগযোগ্য অঞ্চল ও তাতে উপস্থিত কণার সংখ্যা কমে শূন্যতে নেমে আসে। একটি সিস্টেমকে তথ্য প্রসেস করতে হলে সিস্টেমের সব অংশের মধ্যে যোগাযোগ থাকতে হবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আলোর বেগ নির্দিষ্ট হওয়ায় শেষের সময়ের যেকোনো “মস্তিষ্ক”কে ছোট বানিয়ে ফেলবে। এবং এর ফলে হয়ত এমন একটি মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা অবস্থা বা চিন্তার সংখ্যাও কমে যাবে।

এই বাধাকে দূর করতে হলে মহাজাগতিক সঙ্কোচনের শেষ পর্যায়গুলোকে সুষমতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এবং সত্যি বলতে এটাও একটি সম্ভাব্য ঘটনা। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচন নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা গেছে, মহাবিশ্বের অন্তঃস্ফোটনের সাথে সাথে বিভিন্ন দিকে অন্তঃস্ফোটনের হার ভিন্ন ভিন্ন হবে। উৎসুকের ব্যাপার হলো, এক দিকে দ্রুত ও আরেক দিকে ধীরে মহাবিশ্বের সঙ্কোচনটাই শুধু বিষয় নয়। ব্যাপার হলো, স্পন্দন শুরু হলে সবচেয়ে দ্রুত অন্তঃস্ফোটনের দিকও পাল্টে যায়। বাস্তবতা হলো, বিলুপ্তির আগের সময়ে ক্রমেই বেড়ে চলা উন্মাদনা ও জটিলতার ফলে মহাবিশ্ব এদিক-ওদিক দোল খেতে থাকে।

ব্যারো ও টিপলার ধারণা করছেন, জটিল এসব স্পন্দনের কারণে প্রথমে এক দিকের ঘটনা দিগন্ত হারিয়ে যাবে। পরের হারাবে অন্য দিকের ঘটনা দিগন্ত। ফলে সব দিকের অঞ্চলই হাতের নাগালে থাকবে। মহামস্তিষ্কগুলোতে হতে হবে বুদ্ধিতে ভরপুর। স্পন্দনের কারণে এক দিকে অন্য দিকের চেয়ে অন্তঃস্ফোটন দ্রুত ঘটতে থাকলে যোগাযোগের দিকও বদলে ফেলতে হবে। প্রাণীরা তাল মিলিয়ে চলতে পারলে স্পন্দন থেকেই চিন্তা প্রসেস করার প্রয়োজনীয় শক্তি মিলবে। এছাড়াও সরল গাণিতিক নমুনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মহাধ্বসের মাধ্যমে সমাপ্তির আগের সসীম সময়ে অসীমসংখ্যক স্পন্দন হবে। এর মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে অসীম পরিমাণ তথ্য প্রসেস করার সুযোগ হবে। তার মানে মহাপ্রাণীদের হিসাবে সময়ের পরিমাণ হবে অসীম। ফলে তাদের মনের ভেতরে জগতটার কখনও ইতি ঘটবে না। যদিও মহাধ্বসের মাধ্যমে ভৌত জগৎ হঠাৎ করে নেই হয়ে যাবে।

অসীম ক্ষমতার একটি মস্তিষ্ক কী করতে পারে? টিপলারের মতে এটি এর নিজের অস্তিত্বের সবগুলো দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবে না। পুরো মহাবিশ্বকেও বুঝতে পারবে না। কিন্তু তথ্য প্রসেসের ক্ষমতা অসীম হওয়ায় এটি ভার্চুয়াল বাস্তবতায় কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে যেতে পারবে। এভাবে এটি মনোজগতে অসীমসংখ্যক সম্ভাব্য মহাবিশ্বকে ধারণ করতে পারবে। শেষ তিন মিনিট শুধু অসীম পর্যন্তই বিস্তৃত হবে না, এ সময় অসীম রকমের ছদ্ম বাস্তবতাও তৈরি করা যাবে।

তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, (কিছুটা পাগলাটে) এই ধারণাগুলো খুব নির্দিষ্ট ভৌত নমুনার ওপর নির্ভরশীল। হয়ত সেগুলো একেবারেই অবাস্তব। এছাড়া এগুলোতে কোয়ান্টাম প্রভাবকেও উপেক্ষা করা হয়েছে, যে প্রভাব হয়ত শেষ সময়ের মহাকর্ষীয় অন্তঃস্ফোটনকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই প্রভাবের কারণে হয়ত তথ্য প্রসেসের হারেও একটি চূড়ান্ত সীমা বাঁধা থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা আশা করব, মহাপ্রাণী বা সুপারকম্পিউটার যেন অন্তত অস্তিত্বকে যথেষ্ট পরিমাণ বুঝতে পেরে হাতে থাকা সময়ে নিজের সমাপ্তিকে সহজে মেনে নিতে পারে।

অনুবাদকের নোট

১। আগেও এর কারণ বলা হয়েছে। আলোর বেগ অনেক বেশি হলেও নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে আমরা ইচ্ছেমতো দূরের জিনিস দেখতে পারি না। শুধু যত দূর থেকে আলো আমাদের চোখে এসে আসতে পেরেছে, তত দূরের জিনিসই দেখতে পাই। তবে সময় গড়াবার সাথে সাথে আরও দূর থেকে আলো আসার সুযোগ পাবে বলে ক্রমেই আরও দুরের ও অতীতের বস্তুও আমরা দেখতে পারব।

২। মহাজাগতিক মাপকাঠিতে দূরে সরা বস্তুর আলোর কম্পাঙ্ক কমে যায়। ফলে বেড়ে যায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এ কারণে দৃশ্যমান আলোর রং লাল হয়ে যায়। এটাই লোহিত সরণ।

৩। এক রেখার দুই দিকে একই রকম দেখা গেলে তাকে প্রতিসম জিনিস বা ঘটনা বলে। ...

৪। আলো এক সেকেন্ডে যত দূর যায় তাকে এক আলোকসেকেন্ড বলে। যেমনি এক বছরে অতিক্রান্ত পথকে এক আলোকবর্ষ বলে। তার মানে এক আলোকসেকেন্ড আসলে এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার।